সংশপ্তক উপন্যাসে বিপ্লবী চেতনার স্বরূপ

মোঃ আরিফুল ইসলাম*

[সারসংক্ষেপ : বিপ্লবী ধারার বাংলা উপন্যাসে শহীদুল্লা কায়সার উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর লেখায় সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষদের কঠিন জীবনসংগ্রামের নিখুঁত চিত্র দেখা যায়। 'সংশপ্তক' তাঁর এই ধারার একটি সফল উপন্যাস, যেখানে শাসকশ্রেণি ও সমাজপতিদের নির্মম নির্যাতনের মুখোমুখি সাধারণ মানুষদের দুঃসাহসী লড়াইয়ের একটি বাস্তব চিত্র দেখা যায়। এসব মানুষেরা শোষকের নিপীড়ন মুখ বুজে সহ্য করে না। তারা প্রতিবাদী হয়ে মুক্তির নেশায় মেতে ওঠে–শোষকের অশুভ শক্তিকে নস্যাৎ করে এগিয়ে যায় সামনের দিকে। লড়াইয়ের এই নেশা তাদের নিস্তরঙ্গ জীবনে বয়ে আনে নতুন গতি।]

বাংলা সাহিত্যে শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৬-১৯৭১) এক অনন্য প্রতিভার নাম। ছাত্রজীবন থেকে আমৃত্যু বামধারার বিপ্লবী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত মানুষের জীবনসংগ্রাম সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছেন। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, শোষণ, সাম্প্রদায়িক সংঘাত, ধর্মীয় অনাচার, সামাজিক বৈষম্য ও সামন্ত প্রথার নির্মমতায় নিষ্পেষিত সাধারণ মানুষের দুর্বিষহ জীবনসংগ্রামের এক বাস্তব চিত্র তাঁর *সংশপ্তক* উপন্যাস। সাধারণ মানুষ, যাদের দুবেলা অন্নের জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয় তাদের এ পরিশ্রমের ফসলও জমিদারদের হাত থেকে তারা রক্ষা করতে পারে না। ইংরেজ শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট জমিদার, মহাজনেরা নানা রকম ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে সাধারণ মানুষের রক্ত শোষণ করে। এই নির্মম শোষণের শিকার মানুষগুলো পড়ে যায় অস্তিত্বের সংকটে। দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায় এসব মানুষদের। তারা ঘুরে দাঁড়াতে চায়, বাঁচতে চায়। সংগ্রাম, বিদ্রোহ, বিপ্লব ও ক্ষোভ শোষিত মানুষদের প্রেরণার উৎসে পরিণত হয়। শত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করেও ইংরেজ শাসকদের সৃষ্ট জমিদার ও মহাজনদের নির্যাতনের আঘাত সয়ে তারা সামনে এগিয়ে যায়। সমাজপতি ও ধর্মের ধ্বজাধারীদের দোররার আঘাত তাদের পিঠ পর্যন্ত সীমিত থাকে কিন্তু অন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সারা পৃথিবীতেই অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয় এবং তার প্রভাব পূর্ব বাংলায়ও পড়ে। প্রকট দারিদ্র্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয় দেশ। এই দুরবস্থাকে পুঁজি করে মহাজনেরা তৎকালীন সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষকে ঋণের ফাঁদে ফেলে শোষণের মাত্রাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে ধর্মকেও তারা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। শাসকদের সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে একদিকে সাধারণ মানুষ নিঃস্ব হয়, অপরদিকে জমিদার মহাজনেরা অর্থের পাহাড় গড়ে তোলে। শহীদুল্লা কায়সার রচিত উপন্যাসে ফুটে উঠেছে শোষিত মানুষের জীবনালেখ্য ও তাদের প্রতিবাদের চিত্র। *সংশপ্তক* এই ধারার একটি অন্যতম সফল উপন্যাস। এ প্রসঙ্গে রণেশ দাশগুপ্ত লিখেছেন,

> সংশপ্তক উপন্যাসে একটি যুগান্তরের ইতিকথা বিন্যস্ত। ১৯৩৮ থেকে ১৯৫১ সাল। এর মধ্যে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানকল্পে উপমহাদেশের যে মুক্তি-সংগ্রাম চলছিল, তার

*প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

> দ্বন্দ্বাত্মক গতিধারায় সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার জটিল প্রশ্নের উদ্ভব, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষাবস্থা, যুদ্ধাবসান ও কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশ বিভাগ এবং দেশ বিভাগের পরে মুক্তি-সংগ্রামের পালাবদল এবং বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামের সূচনা-এই কয়েকটি পর্বের পটভূমিতে বাংলাদেশের দুটি গ্রামের কয়েকটি চরিতকথা সংশপ্তকে উন্মোচিত। (রণেশ, ১৯৭৩ : ২১০)

সুতরাং বলা যায়, নিপীড়িত মানুষের গর্জে ওঠার এক বিশ্বস্ত দলিল এই 'সংশপ্তক'। এর চরিত্রগুলো মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় সদাজাগ্রত। রক্তমাংসের এই মানুষগুলো যেন সত্যিকারের সংশপ্তকে পরিণত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে বিপ্লবী চেতনাসমৃদ্ধ উপন্যাসের একটি ধারা লক্ষ করা যায়। এই ধারার উপন্যাসগুলোতে নিম্নবর্গের মানুষদের ওপর শোষকদের নিপীড়নের চিত্র এবং তৎসাপেক্ষে নিপীড়িত শ্রেণির মানুষদের আন্দোলন ও ক্ষোভ উত্থাপিত হয়েছে। যেমন– বেগম রোকেয়ার *সুলতানার স্বপ্ন* (১৯২২), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মা নদীর মাঝি* (১৯৩৬), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *পথের দাবী* (১৯২৬), আবু ইসহাকের *সূর্য দীঘল বাড়ী* (১৯৫৫), মহাশ্বেতা দেবীর *হাজার চুরাশির মা* (১৯৭৪), *অগ্নিগর্ভ* (১৯৭৮); দেবেশ রায়ের *মানুষ কেন খুন করে* (১৯৭৪) প্রভৃতি।

শহীদুল্লা কায়সার রচিত দুটি উপন্যাসের মধ্যে '*সংশপ্তক*' তাঁর প্রকাশিত দ্বিতীয় উপন্যাস (সাকলায়েন সম্পা. *শহীদুল্লা কায়সার রচনাবলী*, *২য় খণ্ড*)। 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ববর্তী কাল থেকে শুরু করে যুদ্ধোত্তর ও বিভাগোত্তর কালে ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলনের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত বাংলাদেশের সামাজিক জীবনসত্য এ উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে' (সরিফা, ২০০৮ : ৪৪)। এ সময় বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের ওপর ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী ও তাদের সৃষ্ট জমিদার-মহাজনেরা নির্মম নির্যাতন চালিয়েছিল। তাদের নির্যাতনের মুখে রুখে দাঁড়িয়েছিল এসব সাধারণ মানুষেরা। *সংশপ্তক* উপন্যাসের শুরুতেই এরকম একটি চিত্র দেখা যায়। গ্রাম্য পঞ্চায়েতে সালিশের নামে অসহায় পিতৃ-পরিচয়হীনা হুরমতির ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় অবৈধ যৌনসম্ভোগের দায়। যেখানে অপরাধী পুরুষটি থাকে ধরাছোঁয়ার বাইরে। পরাধীন ভারতবর্ষের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অপরাধের দায় শুধু নারীকেই বহন করতে হয়। যেখানে পুরুষদের অন্যায়ের শাস্তির কোনো বিধান নেই। *সংশপ্তক* উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলো পুরুষতন্ত্রের এই নির্মম নির্যাতন মুখ বুজে সহ্য করে না। তারা প্রতিবাদ করেছে। অন্যকে প্রতিবাদী হতে সাহস জুগিয়েছে। এক্ষেত্রে হুরমতি চরিত্রটির উল্লেখ করা যায়। পঞ্চায়েতের কঠিন শাস্তির মুখেও হুরমতি ভাবলেশহীন। লেখকের ভাষায়,

> এত যে গালি তাতে ভাবান্তর নেই ওর মুখে। একটু হেলছেও না, কাঁপছেও না। মিঞার ধমকে মাথায় ঘোমটা তুলল না ও। একটিবার চেয়েও দেখল না হকুমদাতা ফেলু মিঞার অথবা রমজানের দিকে। বাঁশের ছিলার মত দেহটাকে টান করে, ঘাড়টিকে তেরছা করে অদূরের এক খণ্ড চেলা কাঠের দিকে চেয়ে সেই যে দাঁড়িয়ে আছে, আছেই। (শহীদুল্লা, ২০০০ : ৯)

এ দাঁড়ানোতে ঝরছে বিদ্রোহের আগুন। লেখক জানাচ্ছেন,

> নিঃশঙ্ক ঔদ্ধত্যে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি, যেমনটি প্রথমেই এসে দাঁড়িয়েছিল। ওসব হুমকি ধমক বুঝি শোনা আছে তার, পরোয়া করে না সে। শুধু একবার পা থেকে বাঁ পায়ে নিয়ে এল

> দেহের ভারটা। অবস্থান পরিবর্তনের আচমকা আলোড়নে ওর অন্তর্বাসহীন দুটি স্তন উত্তাল তরঙ্গের ফণার মতন মাথা তুলে কেঁপে কেঁপে আবার স্থির হয়ে যায়। ডান পায়ের উপর ভর রেখে ছেঁড়া আঁচলটা এবার খুব সেঁটে পিঠের এলোমেলো ছড়ানো চুলের উপর দিয়ে পেঁচিয়ে আনল মেয়েটি। তারপর গলার কাছটিতে দোপাট্টা করে বেঁধে নিল। আর সে বন্ধনে ওর ফালি-বাঁশ দেহটি নাভি অঞ্চল থেকে ঈষৎ বেঁকে এল ছিপের আগার মতো। পুষ্ট অথচ ধারালো দেহের ওই বঙ্কিম ভঙ্গিটিই যেন বিদ্রোহের প্রকাশ্য ঘোষণা। থোড়াই পরোয়া করে সে এই পঞ্চায়েতের। (শহীদুল্লা, ২০০০ : ১১)

বিচারের নামে একজন অসহায় নারীর গায়ে সমাজপতিরা কালিমালেপন করে শাস্তির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে, এতে কিন্তু হুরমতি একটুও টলেনি; বরং প্রতিবাদের মাধ্যমে সমাজের প্রতি চরম ঘৃণা প্রদর্শন করেছে, 'যারা থুক থুক করছে নীরব অবজ্ঞায় সেই থুতু যেন ফিরিয়ে তাদেরই গায়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ৯)।

ঔপনিবেশিক শাসনামলে যে সমাজ তার প্রয়োজনে হুরমতির মতো নারীদের ব্যবহার করে, সে সমাজের প্রতি চরম বিদ্বেষ ঘোষণা করেছে *সংশপ্তক* উপন্যাসের নারী ও পুরুষ চরিত্রগুলো। বিশেষ করে হুরমতি, রাবু ও আম্বরির ভূমিকা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। নির্যাতিত এসব নারীরা শুধু প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত হয়নি প্রতিশোধও নিয়েছে। যে রমজান হুরমতির কপালে কলঙ্কের তিলক লাগিয়েছিল, হুরমতি সেই রমজানের কান কেটে প্রতিশোধ নিয়েছে। বিপ্লবে, ক্ষোভে, আক্রোশে ফেটে ওঠা হুরমতির এই প্রতিশোধ যেন অবধারিত। উপন্যাসটির শুরু থেকেই হুরমতি ছিল সাহসের প্রতিচ্ছবি। অবশেষে রমজানের কান কেটে সে তার এতদিনের মনের জ্বালা মেটালো। ড. অশোক মিস্ত্রির মতে,

> যদিও দীর্ঘ প্রতীক্ষিতা, জেদী, বিদ্রোহিনী, পাল্টা প্রতিশোধস্পৃহ হুরমতিও তার প্রতিশোধ নিয়েছে অভিনব কৌশলে, পরিণত করেছে অমোঘ দেহের ফাঁদে বেদিল নাফরমানিতে, উন্মাদ, মরিয়া কাণ্ডজ্ঞানশূন্য লুব্ধ কামার্ত প্রজ্বলিত মোমের ন্যায়, লালাঝরা প্রবল অগ্নিনিঃশ্বাসী লোমশ গরিলাসম শিকারি হিংস্র পশুকে বিপন্ন শিকারে। রমজানকে ভূষিত করেছে নাটকীয় আকস্মিকতায় নতুন একটি অভিধায় 'কানকাটা রমজানে'। যার পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয় ২য় বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা আন্দোলন, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, স্বাধীনতা, দেশ-বিভাগ, ইংরেজ বিদায়, হুরমতি অনেক চড়াই উৎরাই ভেঙে ফিরে আসে সেই বাকুলিয়ায় আজন্মলালিত স্বপ্ন-স্বর্গে ভুমিহীন, আম্বরিহীন লেকুকে নিয়ে বিগত যৌবন সংসার সীমান্তে। (অশোক, ২০০৮ : ১৩১)

সংশপ্তক উপন্যাসের নিপীড়িত মানুষগুলো বিপ্লব ও প্রতিবাদের মাধ্যমে এভাবেই মুক্তি খুঁজে নিয়েছে।

বাংলা উপন্যাসে এমনি একটি চরিত্র *সূর্য দীঘল বাড়ী* উপন্যাসের জয়গুন। স্বামী মারা যাওয়ার পর সন্তান নিয়ে অকুল পাথারে পড়ে সে। সন্তানদের বাঁচানোর জন্য সূর্য দীঘল বাড়ীতে বসবাস শুরু করে। বেঁচে থাকার তাগিদে নেমে পড়ে কঠিন জীবন সংগ্রামে। কিন্তু ধর্মের ঝাণ্ডাধারী মোল্লারা জয়গুনের বিরুদ্ধে বেপর্দা হওয়ার ফতোয়া দেয় এবং ধর্মীয় সকল কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করে। হুরমতির মতো জয়গুনও তাদের পরোয়া করে না। সাহসের সঙ্গে সেও এগিয়ে চলে সামনের দিকে।

পুরো উপন্যাসজুড়ে সাহসের প্রতীক সেকান্দর মাস্টার, যে নিজের ভবিষ্যতের কথা বাদ দিয়ে সাধারণ মানুষের মুক্তির জন্য নিজেকে নিয়োজিত করেছে। সমালোচকের ভাষায় 'সেকান্দর মাস্টার বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামেরই সাধক কর্মীচরিত্রের প্রতিভূ। সেকান্দর হচ্ছে সেই কর্মীদের একজন যারা মুক্তিসংগ্রামকে তার মহাবৈপ্লবিক বিশ্বপরিপ্রেক্ষিতেও পল্লিগ্রামের সাধারণ মানবমানবীর নিজস্ব অভিজ্ঞতালব্ধ সংগ্রাম বলে প্রমাণিত করেছে' (রণেশ, ১৯৭৩ : ২২৩)। এই সেকান্দরই বাকুলিয়ার কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করেছে, জাহেদের মাধ্যমে প্রাপ্ত সংগ্রামের আহ্বানকে কৃষকদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। তাই কৃষকদের অধিকার আদায়ের জন্য সেকান্দর কখনো ফেলু মিঞার কাছে অনুরোধ করে কিংবা কখনো গর্জে ওঠে, 'দু'বছর পরপর দুর্যোগ গেল, ওরা কোত্থেকে খাজনা দেবে? ওদেরও কিছু মাফ করে দিন, নতুবা যা নেবার সে নেবেন আগামী সনে' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ৭৯)। বাংলাদেশের কৃষিজীবী মানুষদের অবিরাম লড়াইয়ের কথা বলা হয়েছে এ উপন্যাসে। ফেলু মিঞার খাজনা শোধ করার জন্য রামদয়ালের কাছে জমি রেহান দেয় লেকু, তবুও হাত পাতেনা ফেলু মিঞার কাছে। অদম্য মনোবলে লেকু আবারো ঘুরে দাঁড়াবে। রেহানের জমি ফিরিয়ে আনবে। তাইতো লেকু বলে 'কারো ধারি না আমি, কারো খাই না। কামাই করব, আবার ফিরিয়ে আনব আমার জমি' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ৯৪)। এভাবেই লেকুদের লড়াই চলে। অনেকেই খাজনা শোধ করতে না পেরে ভিটে মাটি ছেড়ে চলে যায়। তবুও তারা হার মানে না। সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, তবুও এসব কৃষকেরা নতুন জীবনের আশায় চিরদিনের জন্মভূমি ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। এভাবেই কসির, ফজর আলীরা শেষ পর্যন্ত ভূমিহারা হয়। শেষ বেলায় যাবার সময় কসির কেঁদে বলে, 'মাস্টারসাব মানুষ হয়ে লই, মানুষ হয়ে আবার আসব' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ১১)। কসিরের এই উক্তিতে ক্ষোভ, ঘৃণা ও বিদ্রোহ দেখা যায়। সংগ্রামী মানুষেরা যুগে যুগে এভাবেই শোষকের অত্যাচারে পিষ্ট হয়ে চিরদিনের জন্মভূমি ত্যাগ করে অন্য কোনো স্থানে আবাস গড়ে। তবে নতুন স্থানে গিয়েও তাদের এই সংগ্রামের শেষ হয় না। মানবতার এই নির্মম পরিণতিতেই সেকান্দর মাস্টারের মনের ভিতর জন্ম নেয় ক্ষোভ, প্রতিবাদ। তার ভিতরটা আস্তে আস্তে ফুঁসে ওঠে। এক্ষেত্রে মুহম্মদ ইদরিস আলীর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য,

> জাতীয় মুক্তি-অন্বেষায়, আজীবন ব্রতী এ উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র শিক্ষিত গ্রামীণ মধ্যবিত্ত সেকেন্দার মাস্টার এ ধারার বিশিষ্ট চরিত্র। বাকুলিয়া-তালতলি এলাকার সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতিমূলক জীবনধারাকে সত্যিকার স্বাধীনতা ও মুক্তির দিগন্তে পৌঁছে দেবার ব্রতে কৃষক-সন্তান সেকেন্দারের ভূমিকা ব্যতিক্রমী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা প্রভৃতির মাধ্যমে নানা পরিবর্তনের ঢেউ বয়ে গেলেও সেকেন্দারের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেনি। এবং গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণকে ছেড়ে কোথাও পালিয়ে বাঁচতে আগ্রহী হয়নি সে। সেকেন্দার অসাম্প্রদায়িকই শুধু নয়, শ্রেণী সচেতনও। সেকেন্দারের চিন্তা-ভাবনা সুস্থ, যুগোপযোগী ও বিজ্ঞানভিত্তিক। তার দৃষ্টিতে স্বাধীনতা অর্জনের অর্থ ইংরেজ বিতাড়ন তো বটেই সঙ্গে সঙ্গে জমি-রুটি-রুজি, জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা লাভ। জাতীয় মুক্তি অর্জন ও স্বদেশান্বেষায় সেকেন্দার প্রথমাবধিই বামপন্থার অনুসারী তথা সমাজতন্ত্রের অভিমুখী। এ গ্রন্থের সত্যিকার সংশপ্তক আর কেউ নয়–সেকেন্দারই। (ইদরিস, ১৯৮৮ : ১৩৩–১৩৪)

ফেলু মিঞা আর রামদয়ালদের মিলিত শোষণে দরিদ্র মানুষেরা ঘরছাড়া। এই দখল, শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে সেকান্দর মাস্টার, 'আজ এর ছাগল চুরি, কাল ওর ক্ষেতের ফসল চুরি, মারামারি অশান্তি লাগিয়েই রেখেছে। এই হার্মাদ শয়তানগুলোকে শায়েস্তা করতে হবে,

ওদের হাত-পা ভেঙ্গে দিতে হবে' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ১০৯)। এভাবেই তালতলি স্কুলের তিরিশ টাকা মাইনের জুনিয়র মাস্টার সেকান্দর বুক চিতিয়ে লড়াইয়ে নামে ফেলু মিঞা ও রমজানদের বিরুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত ফেলু মিঞা সেকান্দরকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়। মামলায় পড়ে সেকান্দর আর লেকু চরম বিপদে পড়ে। কারণ, 'থানা আর মিঞা বাড়ির যতটা নৈকট্য সেকান্দর আর থানার মাঝে বুঝি ঠিক ততটাই দূরত্ব' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ১১৮)। রাষ্ট্র, সমাজ ও বিচারালয় সবকিছুই সেকান্দরদের বিপক্ষে। তবুও এরা বাঁচতে চায়। লড়াই করতে চায়। কিছুতেই হাল ছাড়তে চায় না, 'এ উপন্যাসের মানুষেরা হচ্ছে, এ কালের সংশপ্তক সেনা। পৌরাণিক কাহিনীর সংশপ্তক অর্থাৎ নিশ্চিত পরাজয় জেনেও যুদ্ধ করে যাওয়া সৈনিকের মতো সংগ্রাম করে যায় এ উপন্যাসের চরিত্রগুলি' (শফিউল, ২০০১ : ১১৬)।

মুক্তিকামী মানুষের সাহসী উচ্চারণে ঠাঁসা এক উপন্যাসের নাম *সংশপ্তক*। যার পুরো শরীর জুড়ে রয়েছে বঞ্চিত মানুষের ফুঁসে ওঠার চিত্র, যাদের অধিকাংশই কৃষিজীবী সমাজের বাসিন্দা। অথচ এই কৃষকেরা জমিদারের হাতে বন্দি। বেশিরভাগ কৃষকই অন্যের জমিতে বর্গা খাটে। অভাব-অনটন তাদের নিত্যসঙ্গী। বর্ষার সময় যাদের ঘরবাড়ি বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে। মাঘ, ফাল্গুন এই দুটি মাসই তাদের কাজের সময়। সারা বছরের সব কাজ শেষ করতে হয় এ সময়ের মধ্যেই। অথচ এ সময়েই জমিদার খাজনা পরিশোধের আকস্মিক সমন জারি করে। এর প্রতিবাদে গর্জে ওঠে লেকু। তার মুখে সাহসী উচ্চারণ, "খাজনা দেব না, ভিটিও ছাড়ব না, দেখি কি করতে পারে। মিয়ার 'পুত'"শহীদুল্লা, ২০০০ : ৬৮)। ফেলু মিঞাদের নিপুণ ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পড়ে এসব মানুষগুলো যখন ন্যায়বিচার পায় না। তখন আর মানুষের কাছে বিচার না দিয়ে তারা খোদার কাছে বিচার দেয়। সমগ্র উপন্যাসটি যেন নিষ্পেষিত এসব মানুষদের বিদ্রোহের জ্বালায় অনবরত জ্বলছে। ফেলু মিঞার সহযোগিতায় রমজান যখন লেকুকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে আহত করে তখন বিচার না পেয়ে লেকুর স্ত্রী আম্বরি খোদার কাছে বিচার চায়, 'এত হার্মাদি সইবে না খোদা। খোদা জ্যান্ত কবরে নিবে তোকে। খোদার ঠাডা পড়বে, পুত মরবে ঝি মরবে, সর্বস্বান্ত হবি। নিজের বিষ্ঠা নিজে খাবি' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ১১১)। আম্বরির এই অভিসম্পাত দীর্ঘদিন ধরে বুকের ভিতর জমে থাকা ক্ষোভের, বিদ্রোহের। বিপ্লবের মহা উত্তাপে মেতে ওঠা সেকান্দর মাস্টার যেকোনো মূল্যে মানবতার মুক্তি চায়। অবরুদ্ধ মানুষকে মুক্তির স্বাদ দিতে চায়। তাইতো যুদ্ধ ও দাঙ্গার ফলে মানুষের অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও দীপ্তকণ্ঠে উচ্চারণ করে 'এ মৃত্যুকে আমি রুখব। আমি মৃত্যুঞ্জয়ী হব। আমি মরণ-জয়ের ডঙ্কা বাজাব, সবাইকে শোনাবো মৃত্যুহীনের ডাক' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ১৫১)। সত্যিকারের বিপ্লবীরা কখনো পরাজিত হতে শেখেনি। শেষ পর্যন্ত তারা লড়াই চালিয়ে যায়। শত দুঃখেও তারা ভেঙে পড়ে না। লড়াই সংগ্রামে তাদের কোনো ভয় নেই। যুদ্ধের সর্বনাশা আগুনে পুড়ে চতুর্দিকে মানুষের মৃত্যুর মিছিল। অথচ সেকান্দর মাস্টার বুক চিতিয়ে লড়ে যায় মানুষের পক্ষে, জীবনের পক্ষে, 'দুঃখ সওয়া, দুঃখ নেওয়া খুব বড় জিনিস রে মালু, খুব বড় জিনিস, দুঃখের আগুনে যে না পুড়েছে সে চিনতে পারে না, জানতে পারে না, এই দুনিয়াটাকে' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ১৯৭)। এভাবেই সেকান্দর বিপ্লবের এক মূর্ত প্রতীকরূপে সমগ্র উপন্যাসে বিরাজ করে।

সংশপ্তক উপন্যাসের নেতৃত্বগুণসম্পন্ন অন্যতম প্রধান চরিত্র জাহেদ, আলিগড় থেকে লেখাপড়া শিখে একটা পরিবর্তনের বৈপ্লবিক বাণী নিয়ে গ্রামে প্রবেশ করে। তার স্বপ্ন বাংলাদেশের অজ পাড়াগাঁ একদিন সুখী ও সমৃদ্ধ হবে। মানুষের জীবনমান উন্নত হবে।

তাইতো জাহেদ বলে ওঠে 'চাষ চলবে কলের লাঙলে। ফসল উঠবে যারা চাষ করবে তাদেরই ঘরে। জমিদার তালুকদার-মহাজনের বাখরাদারী চলবে না। ডায়নামো বসবে। বিজলী বাতি জ্বলবে গাঁয়ের ঘরে ঘরে। ক্লাব থাকবে, রেডিও থাকবে গাঁয়ে গাঁয়ে। স্কুল থাকবে প্রতি গ্রামে, কৃষকের ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া শিখবে বিনে মাইনেয়' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ১২৩-১২৪)। পরিবর্তনের অবিনাশী বার্তা নিয়েই উপন্যাসে জাহেদের আগমন। একপর্যায়ে জাহেদের বাণী পরিণত হয় বিপ্লবের বাণীতে। বাকুলিয়ার সেকান্দর মাস্টারও এই বাণীতে মুগ্ধ হয়ে পড়ে। তার চোখেও খেলা করে অনাগত এক সুন্দরের ভবিষ্যৎ। সেকান্দর যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইছে না জাহেদের এই কল্পিত ভবিষ্যৎ, তখনই জাহেদ তার বিপ্লবের বাণী বলে ওঠে, 'দেশ জুড়ে যে বেজে উঠেছে স্বাধীনতার ডঙ্কা। দিকে দিকে আজাদীর বুলন্দ্ আওয়াজ। দেশ আর কতদিন সহ্য করবে গোলামির জিঞ্জির? ইংরেজের যাবার দিন এসে গেছে যে, এসে গেছে' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ১২৪)।

এভাবেই জাহেদ স্বাধীনতার দাবি নিয়ে হাজির হয় বাকুলিয়ায়। তার দীপ্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুক্তির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাকুলিয়ার কৃষক সমাজ। দীর্ঘদিন শাসন, শোষণ মুখ বুজে সহ্য করলেও এখন তারা স্বাধীনতার আন্দোলনে বলীয়ান। তারা মুক্তি চায়। লেখক জানাচ্ছেন, 'সেই ঠাণ্ডা রক্তের মানুষগুলো মেতে উঠল কি এক উন্মাদনায়। মেতে উঠল ফজর আলী। মেতে উঠল মৃধা বাড়ির সেই রহমত বুড়োও। গরুর গাড়িটা নিয়ে জাহেদের সাথে সাথে সেও পাড়ি দেয় এ গাঁ সে গাঁ। দুর্বল লেকু সেও বসে থাকতে পারে না ঘরে' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ১৩১)। *সংশপ্তক* উপন্যাসটা যেন এভাবেই হয়ে উঠলো বিপ্লবের এক মহা ইশতেহার। চূড়ান্ত মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়াই এই বিপ্লবের লক্ষ্য। গবেষকের মতে,

> *'সংশপ্তক'*-এ সমাজ এবং সময় চলমান; ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে এগোতে থাকে উপন্যাস। এগিয়ে যাওয়াটাই এ-উপন্যাসের ক্ষেত্রে আসল কথা। কোন প্রকারের স্থিতির ইঙ্গিত টানেননি ঔপন্যাসিক। যে-জাহেদের প্রত্যাশা ছিল দেশ ভাগের মধ্যেই ঘটতে পারে সকল সার্থকতা, সে-ও আর স্থিতিতে নেই। শোষিত মানুষের মুক্তির সংগ্রামে সে দীক্ষা নেয় সমাজতন্ত্রে। (মহীবুল, ২০০২ : ১৩০)

সমাজতন্ত্রে দীক্ষিত জাহেদের সুযোগ্য নেতৃত্বে সর্বহারার দল বিপ্লবে জড়িয়ে পড়ে, 'সমাজতন্ত্রবাদী বিপ্লবে নিষ্ঠাবান ও সম্ভাবনাময় জাহেদ আত্মত্যাগে ও সাংগঠনিক শক্তির প্রকাশে উজ্জ্বল। ভাববাদী চেতনা থেকে বাস্তবমুখী বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তা-চেতনায় তার উত্তরণ এদেশীয় তরুণদের একাংশের প্রগতিশীল চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার ইতিহাস মনে করিয়ে দেয়' (সরিফা, ২০০৮ : ৫০)। ফলে বাকুলিয়ার নবীন-প্রবীণ দলে দলে সবাই যোগ দেয় স্বাধীনতার আন্দোলনে। এক্ষেত্রে জাহেদ শুধু নেতৃত্বই দেয় না, সরাসরি সাংগঠনিক কাজে জড়িয়ে যায়। নিজ হাতে দমন করে সাম্প্রদায়িকতায় আচ্ছন্ন সেসব অমানুষদেরকে, যারা ধর্মের নামে দীর্ঘদিন ধরে নারীদেরকে ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখে। জোর করে নারীদেরকে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহে বাধ্য করে। বৃদ্ধ পীরের সঙ্গে চৌদ্দ বছরের রাবুর জোরপূর্বক বিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী জাহেদ তার প্রতিবাদ করে, রাবুকে মুক্তি দেয়, 'কাঁথা পুড়ি নতুন জামাইর। খিঁচিয়ে ওঠে জাহেদ।' একপর্যায়ে মাস্তানের দলকে পিটিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেয় জাহেদ। জাহেদের এ আন্দোলনে সংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালি যেন নতুনভাবে বাঁচার খোঁজ পেল, 'জাহেদ চরিত্রের মাধ্যমে শহীদুল্লা কায়সার শিক্ষিত বাঙালি

মুসলমানের আত্মরূপান্তরের ইতিহাস বিবৃত করেছেন। বাস্তবের অভিঘাতে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবাদী জাহেদের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীতে রূপান্তর একটা দ্বন্দ্বময় অথচ বাস্তবসম্মত প্রক্রিয়ায় রূপায়িত হয়েছে' (রফিকউল্লাহ, ১৯৯৭ : ১৭০)। এই জাহেদ শিক্ষার আলোহীন মুসলিম প্রজাদের দুর্দশা দেখে চিন্তিত। মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য মুসলিম লীগের রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়। ভারতবর্ষে বিপ্লবের আন্দোলন তুঙ্গে; এদিকে বাংলাদেশে তার কোনো ঢেউ নেই। তাই জাহেদ বাকুলিয়ার সেকান্দর মাস্টারকে বিপ্লবের আহ্বান জানায়, 'হাজার হাজার মুসলিম তরুণ আজ এক নতুন স্বপ্নে মেতে উঠেছে, নয়া জাগরণের বাণী ওদের মুখে মুখে। আজ বাকুলিয়ায় সে বাণী আর সে স্বপ্নের ডাক নিয়েই তো এসেছি আমি। সেকান্দর, আমি তোমার মদদ চাই। সে বাণী তোমাকেও যে শুনতে হবে, শোনাতে হবে লক্ষ হাজার মানুষকে' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ১২৫)। মুক্তির নেশায় যখন জাহেদ অবিনাশী বিপ্লবীর ভূমিকায় অবতীর্ণ, এই সুযোগে জমিদার ফেলু মিঞা নিজ স্বার্থ উদ্ধারে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ধুরন্ধর ফেলু মিঞা বিপ্লবীদের সঙ্গে মিশে গিয়ে নেতা হতে চায়। যেখানে সর্বসাধারণ এক হয়ে লড়াই করছে শাসকদের বিরুদ্ধে। অথচ ফেলু মিয়া বলে ওঠে 'আমি ভেবেছি, সেক্রেটারি হিসাবে মাস্টারই হবে উত্তম ব্যক্তি, তুমি শুধু ওর মাথাটা টাইট করে দেবে। আর প্রেসিডেন্ট? সে দায়িত্বটা না হয় আমিই নিলাম' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ১২৭)। ফেলু মিঞার এই গদির লোভের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছে জাহেদ, 'প্রেসিডেন্ট আপনি? ও, কাজের নেই দেখা, আর এখনি গদি ভাগাভাগি?' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ১২৭)। এভাবেই জাহেদ ইংরেজ শাসকদের আস্থাভাজন জমিদার ফেলু মিঞার মুখের ওপর প্রতিবাদ করেছে। এখানে গদি মুখ্য নয়, আন্দোলনই মুখ্য। তাইতো জাহেদের গলায় পুনরায় বিপ্লবের সুর, 'আমাদের লড়াইয়ের ঘোড়ায় চড়ে আপনার মতো জমিদার তস্য জমিদাররা তখ্‌তে জেঁকে বসবেন সেটি হচ্ছে না কিন্তু। তীরের মতো কথাগুলো ছুঁড়ে মারল জাহেদ' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ১২৭)। এভাবে স্বাধীনতার আন্দোলনে মেতে ওঠা জাহেদ পথে-প্রান্তরে বক্তৃতার ঝড় তোলে। তার এই আন্দোলন হলো ইংরেজ বিতাড়নের আন্দোলন। সে মনে করে শাসকের বদল হলেই মুসলমানদের ভাগ্যের বদল ঘটবে। তার জ্বালাময়ী বক্তৃতার রূপ, 'কথা তো নয়, যেন আগুনের ফুলকি আর মানুষের মুখে মুখে সে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, ঘর থেকে ঘরে। আগুনের আঁচ পেয়ে সহসা বুঝি জেগে উঠে ঘুমন্ত মানুষ। ঝড়ের মত গ্রাম থেকে গ্রামে ছুটে বেড়ায় জাহেদ' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ১৩১)। জাহেদের এই আবেদন সেকান্দরের মনেও ঝড় তোলে। তবে সে মুসলিম লীগের কর্মী জাহেদের মতো শুধু মুসলমানদের কথাই চিন্তা করছে না, হিন্দু হোক কিংবা মুসলিম হোক; তার কাছে মানুষ পরিচয়ই সবার আগে, 'প্রথমে মানুষ, তারপর ধর্ম। মানুষের জন্যই তো ধর্ম। ধর্মের জন্য মানুষ নয়' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ১৫৩)। ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুক্তির চেয়ে সেকান্দর তাই আগে সমাজের মুক্তি চায়। মানুষের মুক্তিই সেকান্দরের লক্ষ্য, 'জাহেদের উদ্দেশ্যে বলে, কদর্থ করছ কেন আমার বক্তব্যের? আমার কথা হল : সমাজটাকে মেরামত করো। শিক্ষা দাও, আলো দাও, গোঁড়ামির অচলায়তন ভেঙ্গে উন্মুক্ত করো বুদ্ধির দ্বারা, কুসংস্কারের বাঁধ ভেঙ্গে এনে দাও মুক্তির প্লাবন।' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ১৩৩)। যে সমাজের মানুষ এখনো কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, তাদেরকে শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। তবেই তারা স্বাধীনতার মর্মার্থ বুঝতে পারবে। তাই সেকান্দরের কাছে 'স্বাধীনতা একটি ব্যাপক, একটি সম্পূর্ণ চিন্তাধারা, একটি সামগ্রিক জীবনবোধ। জীবনের সব ক্ষেত্রেই এর রয়েছে একটা অর্থ, তাৎপর্য। সেটা

হল জাগরণ এবং পুনর্গঠন-নৈতিক-আধ্যাত্মিক, সামাজিক-অর্থনৈতিক-সর্বক্ষেত্রে। তার মানে সংগ্রামটা হবে কঠিন, দীর্ঘস্থায়ী, প্রস্তুতি চলবে ঘরে ঘরে' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ১৭২)। সেকান্দর চেয়েছে মানুষের চিন্তার মুক্তি, মানসিকতার বদল আর জাহেদ চায় রাজনৈতিক মুক্তি। তবে দুজনেই বিপ্লবী আদর্শে বিশ্বাসী। এদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সাধারণ মানুষের কাছে, যারা বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, 'দুঃখ-কষ্ট ভুলে তারা শামিল আন্দোলনের কাতারে; গ্রামব্যাপী রাজনৈতিক সভা-মিছিল-কবিগানে উপস্থিত হয় দলে-দলে। আন্দোলনের স্পন্দন তাদের স্থবির জীবনে আনে গতি' (মহীবুল, ২০০২ : ১৩০)।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সমাজ সংস্কারের ব্রত নিয়ে গ্রামে ফিরে আসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর *লালসালু* উপন্যাসের আক্কাস। গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চায় সে। কিন্তু তাকেও মোল্লাদের ফতোয়ার শিকার হতে হয়। দাড়ি রাখেনি বলে আক্কাসের সমাজ সংস্কারের স্বপ্ন বারবার বাধাগ্রস্ত হয়। বিশ্বসাহিত্যে জাহেদ চরিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি চরিত্র হলো ম্যাক্সিম গোর্কির *মা* উপন্যাসের পাভেল। সমাজ পরিবর্তনের ব্রত নিয়ে তরুণ পাভেল তার সমস্ত বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যায়। অসাধারণ কৌশল ও বুদ্ধিমত্তায় নিপীড়িত মানুষকে বিপ্লবে আগ্রহী করে তোলে। ফলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে। *সংশপ্তক* উপন্যাসে শাসকের হাতে বন্দি জাহেদও যেন পাভেলেরই প্রতিরূপ।

সংশপ্তক উপন্যাসে শোষণ, যুদ্ধ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মতো ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখে পড়া মানুষদের টিকে থাকার অবিরাম সংগ্রামের কথা বলা হয়েছে। যুদ্ধের বাজারে কলকাতায় মালু হয়ে যায় মলিন কুমার দাশগুপ্ত ওরফে মালু। বেঁচে থাকার জন্য হুরমতি যোগ দেয় গোরাদের দলে। বাকুলিয়ার কৃষক লেকু হয়ে যায় নগরের রিকশাচালক। সৈয়দ বাড়ির সেই সরল কিশোরী রাবু, যে একদা বৃদ্ধ স্বামীর জন্য কেঁদে বুক ভাসিয়েছিল সেও আজ প্রতিবাদী। গবেষকের মতে,

> আধুনিক শিক্ষালাভের ফলে রাবুর বিবেক ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়। আত্মজিজ্ঞাসা আর আত্মবিশ্বাসে আজ সে একজন সজাগ নাগরিক। ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতা থেকে যে বিদ্রোহের শুরু তা-ই তাকে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। নিজের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন রাবু জাহেদকে ভালবাসে কিন্তু সংসারী হওয়ার স্বপ্ন দেখে না। কারণ তাতে জাহেদের দেশ গড়ার স্বপ্নে চিড় ধরতে পারে। (সরিফা, ২০০৮ : ৪৪)

বিপ্লবী রাবু দাঙ্গার ভয়াবহতা রুখে দিতে প্রতিনিয়ত মিছিল সংগ্রামে ব্যস্ত থাকে। জাহেদের সতর্কতাকে উড়িয়ে দিয়ে সে বলে 'নিজেদের সামলিও তোমরা, দয়া করে আমাদের নিয়ে মাথা ঘামিও না, আমরা আত্মরক্ষা করতে জানি' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ২৫১)। এভাবেই সামাজিক সংস্কার ও সকল গোঁড়ামির বুকে লাথি মেরে রাবু নিজেকে পরিণত করে এক প্রতিবাদী, তেজস্বী নারীতে। দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে রাবু এখন একজন আলোকিত নারী। এক্ষেত্রে রণেশ দাশগুপ্তের মন্তব্য–

> রাবুর কথাই যদি ধরা যায়, তবে দেখা যাবে, সে স্বল্পভাষিণী হয়েও সেই বীর নারীদের একজনে পরিণত হয়েছে যারা বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামোর বিপ্লবাত্মক ভাঙ্গাগড়ায় পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামে। বাস্তবতা দিয়ে গড়া এমন একটি নারী চরিত্র সমগ্র বাংলা উপন্যাসের গতিধারায় খুব কমই আঁকা হয়েছে। (রণেশ, ১৯৭৩ : ২২১)

জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া বিয়েকে তাই রাবু এখন অবলীলায় অস্বীকার করে, প্রত্যাখ্যান করে। 'কী সম্পর্ক আমার ওই বুড়োর সাথে! তাকে আমি স্বীকার করি না, মানি না। কোনো দিন মানি নি। দৃঢ় উদ্দীপ্ত কণ্ঠ রাবুর। কণ্ঠটা দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ৩৮৮)।

রাবু যেন *সুলতানার স্বপ্ন* উপন্যাসের ছায়াপাঠ। বেগম রোকেয়ার হাত ধরে বাংলায় নারী জাগরণের যে অগ্রযাত্রার সূচনা হয়েছিলো রাবু চরিত্রটি সে অগ্রযাত্রার সফল সোপান হিসেবে পরিণতি পেয়েছে। *সুলতানার স্বপ্ন* উপন্যাসে নারী মুক্তির যে স্বপ্ন আঁকা হয়েছিল রাবুতে তার বাস্তবায়ন লক্ষ করা যায়।

সংশপ্তক উপন্যাসের আরেকটি সংগ্রামী চরিত্র হলো মালু। সৈয়দ বাড়িতে আশ্রিত মালু এ উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র ও ঘটনার সাথে কোনো না কোনোভাবে জড়িত। মালুই যেন এ উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু। সমগ্র উপন্যাসজুড়ে মালুর টিকে থাকার নিরন্তর সংগ্রাম। বাকুলিয়া-কলকাতা-ঢাকা আবার বাকুলিয়া, প্রতিটা স্তরে মালুর সংগ্রামী জীবন। অন্ধকার ভবিষ্যৎ তবুও বেঁচে থাকার প্রচেষ্টায় একটুও কমতি নেই, 'বাকুলিয়ার সেই বয়াতি ছেলেটি বাইশ বছরের জীবনে কত বিচিত্র পথ পাড়ি দিয়ে এল ও' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ২৫৭)। এই বিচিত্র পথ হলো লড়াইয়ের, সংগ্রামের। প্রচণ্ড আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে মালু পুরো উপন্যাসে বিচরণ করেছে। বিত্তবান জীবন সে কখনোই চায়নি। চিত্ত নিয়েই বাঁচতে চেয়েছে, তাইতো প্রচণ্ড ক্ষোভে নিজের এই দুরবস্থার জন্য রাবুকে বলে 'যারা মানুষ নয় তারা তো আস্তাবলেই থাকে' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ২৫৮)। এই মালু রাবুর দুর্দশায়ও ক্ষেপে ওঠে। তাইতো বৃদ্ধ স্বামীর চিঠি পড়ার পর রাবুর নিস্পৃহতা সে সহ্য করতে পারে না, 'মালুর চোখের ক্ষতে আজ ঘৃণার আগুন। অজস্র শিখায় জ্বলে উঠল সে আগুন' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ২৬০)। রাবুকে সে বিদ্রোহের আহ্বান জানাচ্ছে 'তোমার কি ঘৃণা নেই? বর্বরকে কুৎসিতকে তুমি ঘৃণা করো না?' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ২৬১)। এভাবেই উপন্যাসটিতে মালুর বিপ্লবী সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। মালুর এই ঘৃণা করার আহ্বানে রাবু উত্তর দেয় 'ঘৃণা আছে বলেই তো হাসতে পারি' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ২৬৫)। *সংশপ্তক* উপন্যাস যেন ঘৃণার আগুন ছড়ানো এক জ্বলন্ত জনপদের দলিল। এই ঘৃণা শোষকের বিরুদ্ধে, এই ঘৃণা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। এই ঘৃণা ইংরেজদের বিরুদ্ধে। জমিদার, মহাজনদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভই এই ঘৃণার জন্ম দিয়েছে। এখানে সেকান্দর, জাহেদ, রাবু, হুরমতি, লেকু ও মালু সবাই সংশপ্তক। পুনরায় যখন বৃদ্ধ স্বামী রাবুকে নিতে আসে, তখন রাবুর দৃঢ় উত্তর– 'না' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ২৬৫)। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী রাবু আজ আর সেই চৌদ্দ বছরের বালিকা নয়। এ রাবু জীবনযুদ্ধে লড়াকু এক সৈনিক রাবু। আত্মশক্তিতে সে আজ বলীয়ান, সে শক্তির বলেই রাবু আজ আলোর পথে চলছে। তাই রাবুর এই 'না' যেনো সকল নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে, সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে। যেন একটি বজ্রের বিস্ফোরণে কাঁপিয়ে গেল সারা ঘরটা, ঘরের লোকগুলোকে, মোজাদ্দেদী সাহেবকেও' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ২৬৬)। রাবু তার এই স্বাধীন জীবন নিয়ে খুশি। রাবুর এই সাহসী 'না' উচ্চারণকে মালু বলেছিল, 'এর নাম বিপ্লব। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ৩৩৭)। *সংশপ্তক* উপন্যাসে মালুর বিপ্লবও তেমনি দীর্ঘ। সর্বহারা মালুকে শেষে স্ত্রী রিহানাও পরিত্যাগ করে। রিহানাকে হারিয়ে সে যখন নতুন রাজধানী ঢাকায় ফিরে আসে তখন আর মালু বয়াতির আগের কদর নেই। নতুন ঢাকা শহরে আধুনিক গানের ভিড়ে যেন হারিয়ে যাচ্ছে বাংলার মাটির গান, মানুষের গান, লোকসংগীত। শহরের সর্বত্র চলছে অনুকরণের এক

অসুস্থ প্রতিযোগিতা। সবাই নিজের ঐতিহ্যকে, নিজের সংস্কৃতিকে বর্জন করছে। কিন্তু মালু দেশের ঐতিহ্যকে বর্জন করবে না। একাই সে প্রতিবাদ করবে,

> 'উপেক্ষিত অনাদৃত হয়েই থাকুক মালু। আবার যখন আসবে গ্রহণের পালা তখন আপনার ঐশ্বর্য-ভাণ্ডার নিয়ে ওদের সুমুখেই এসে দাঁড়াবে মালু। তদ্দিন? তদ্দিন আপনপথে একলাই চলবে, সেখানেই ওর জিত' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ৩৩৭)

এভাবেই মালু বয়াতি সাংস্কৃতিক লড়াই চালিয়ে যায় সদ্য স্বাধীন দেশে। পরিশেষে অশেষ গঞ্জনা নিয়ে ঢাকা বেতার থেকে প্রতিবাদ স্বরূপ নিজেই পদত্যাগ করে।

একটা সফল বিপ্লবের পূর্বশর্ত হলো ঐক্যবদ্ধ হওয়া। ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামই মুক্তির চূড়ান্ত মাধ্যম। এই সংগ্রাম শুরু হবে প্রথমে ব্যক্তিকে দিয়ে, তারপর ব্যক্তি থেকে সমাজে এবং সমাজ থেকে রাষ্ট্রে। তাই রাষ্ট্রের সচ্চরিত্র নির্মিত হবে ব্যক্তির সচ্চরিত্রের মাধ্যমে। সমাজকে দাঁড়াতে হবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে। তাই ব্যক্তির পরিবর্তন বা প্রতিরোধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, 'এখানে সেখানে ব্যক্তিগত প্রতিরোধ তখনই সার্থক যখন সেটা রূপান্তরিত হয় সমষ্টিগত প্রতিবাদে' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ২৬৭)। রাবুর এ উক্তিটিই যেন পুরো উপন্যাসে ঝংকৃত হয়। সেকান্দর, জাহেদ, লেকু, ফজর, হুরমতি ও মালু প্রত্যেকেই প্রথমে ব্যক্তিগত অবস্থান থেকে প্রতিরোধ শুরু করেছে, পরে তা জাতীয় পর্যায়ে উন্নীত হয়। ১৯৪৭ সালের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অসংখ্য মানুষের প্রাণহানি ঘটে। এই দাঙ্গা রুখতে জাহেদ ও রাবুর অংশ নেয় শান্তি কমিটির আন্দোলনে। আবার মহামারি বসন্তে যখন পুরো গ্রাম মৃত্যুর মড়কে আক্রান্ত, তখনো মানুষের সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করে জাহেদ, রাবু, সেকান্দর ও মালু। প্রকৃতির এই নির্মম আচরণের বিপক্ষেও তারা বুক চিতিয়ে লড়াই করে যায়, 'মৃত্যুর জন্য জীবন কখনো অপেক্ষা করে না। মৃত্যুর পাশাপাশিই জীবনের অস্তিত্ব' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ৩৮০)। তাইতো ওরা প্রাণপণে জীবনের পক্ষে লড়ে যায়। দাঙ্গার পর কলকাতা নগরীতে হুরমতি ও লেকুকে দেখে মালু অবাক হয়। এত লড়াই সংগ্রামের পরেও ওরা বেঁচে আছে। জীবনের নির্মম বাস্তবতায় ওরা হয়তো অনেক রক্তই ঝরিয়েছে। তবুও ওরা হারেনি। দুজনে মিলে আবার হয়তো কোথাও ঘর পেতেছে, 'উজোন টেনে টেনে ওরা ক্লান্ত হয় নি এখনো। কত ঘূর্ণির আবর্তে পড়েছে। স্রোতের মোচড়ে হাড় ভেঙেছে, ছিটকে পড়েছে' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ২৯৫)। তবুও প্রচণ্ড মনোবল নিয়ে এখনো ওরা টিকে আছে। সত্যিকারের সংশপ্তক হয়ে অবিরাম যুদ্ধ করছে নির্মম বাস্তবতার বিরুদ্ধে। এই অদম্য মনোবলই *'সংশপ্তক'* উপন্যাসের বিপ্লবী চরিত্রগুলোর মূল সুর।

যুগে যুগে শোষকের সঙ্গে বিপ্লবীদের অগ্রযাত্রা সমান্তরাল। সে-কারণে সমাজ দ্বান্দ্বিক গতিতে এগিয়ে চলে। এতে শোষকের পতন অনিবার্য। বিপ্লবের অগ্নিশিখায় দগ্ধ হয় শোষক শ্রেণি। ধ্বংস হয় শোষণের কালোহাত। উদয় হয় নতুন দিনের। বিপ্লবীদের পতন নেই, বিপ্লবীদের ধ্বংস নেই। আলোকিত সূর্যের মতো তারা জ্বলতে থাকে মানবতার মুক্তির উজ্জ্বল সৈনিক হয়ে। শাসকদের রক্তচক্ষুকে তারা ভয় করে না। পরোয়া করে না। শহীদুল্লা কায়সারের *সংশপ্তক* উপন্যাসের চরিত্রগুলো এর বাস্তব উদাহরণ। তাই শাসকের হাতকড়া পরেও জাহেদ বলে যায় 'আমি আসব'। (শহীদুল্লা, ২০০০ : ৪০০)। জাহেদের এই ফিরে আসার ইচ্ছা শোষকদের উৎখাত করে সর্বহারার মুক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য। জাহেদের এই ফিরে আসার ইচ্ছা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য, জাতীয় মুক্তির জন্য। এভাবেই জাহেদের

মতো *সংশপ্তক* উপন্যাসের প্রত্যেকটি সংগ্রামী চরিত্র সত্যিকারের সংশপ্তকে পরিণত হয়েছে, 'জাহেদ-রাবু-সেকান্দর-লেকু বাংলাদেশের জনগণের প্রতিভূ। তারা যাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে সেই নয়া-ঔপনিবেশিক শাসকদের অনুচরদের নিপীড়ক চেহারাটাকে সামনে এনেই উপন্যাসটিকে শেষ করেছেন সংশপ্তকের শিল্পরূপকার' (রণেশ, ১৯৭৩ : ২২৪)।

সহায়কপঞ্জি

অশোক মিস্ত্রি (২০০৮)। *শহীদুল্লা কায়সার : জীবন ও সাহিত্য*। শোভা প্রকাশ, ঢাকা।

গোলাম সাকলায়েন [সম্পাদক] (১৯৮৭)। *শহীদুল্লা কায়সার রচনাবলী*-২য় খণ্ড। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মহীবুল আজিজ (২০০২)। *বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গ*। জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা।

মুহম্মদ ইদরিস আলী (১৯৮৮)। *আমাদের উপন্যাসে বিষয়-চেতনা : বিভাগোত্তর কাল*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রণেশ দাশগুপ্ত (১৯৭৩)। *উপন্যাসের শিল্পরূপ* (২য় সংস্করণ)। কালিকলম প্রকাশনী, ঢাকা।

রফিকউল্লাহ খান (১৯৯৭)। *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

শফিউল আযম ডালিম (২০০১)। *দুই বাংলার উপন্যাস : প্রেক্ষিত দুর্ভিক্ষ*। জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা।

শহীদুল্লা কায়সার (২০০০)। *সংশপ্তক* (প্রথম সংস্করণ)। জোনাকী প্রকাশনী, ঢাকা।

সরিফা সালোয়া ডিনা (২০০৮)। *শহীদুল্লা কায়সারের উপন্যাস : বিচিত্রবীক্ষণ*। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।